



## Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 185 - 190

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: [info@tirj.org.in](mailto:info@tirj.org.in)

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

# ‘ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন’ : এক দলিত জীবনের সংগ্রামী লেখোয়াড়

তন্ময় সরকার

গবেষক, বাংলা বিভাগ

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID : [tanmay14.net@gmail.com](mailto:tanmay14.net@gmail.com)

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

### Keyword

Partition,  
Refugee Crisis,  
Dalit,  
Autobiography,  
Subaltern  
Politics.

### Abstract

In the corpus of Dalit writings in India, Manoranjan Byapari is a significant name. He has given voice to those voiceless whose pain and suffering have never found a place in the grand narrative of the Indian nation-state. In his literary oeuvre, the lived reality of the Bengali Dalits found a greater place. Published in 2018, his seminal work *Interrogating My Chandal Life: An Autobiography* stands as a witness to the dislocation of the Bengali Dalits. Due to an unjust political problem i.e. Partition, a large number of Bengalis had lost their homeland and became refugees. These people were forced to migrate to the Sunderban area of Bengal or to the jungles of middle India. Manoranjan Byapari was one of them. Carrying the anguish of his own life, this book offers a pen picture of the refugee crisis, particularly the Dalit issue. Therefore, the paper aims to explore: (i) the lives of the refugees (ii) the author's experience with the dirty politics of Bengal, and (iii) how Dalit Autobiography became an emerging literary genre.

### Discussion

একুশ শতকের এক জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক মনোরঞ্জন ব্যাপারী। তিনি স্ব-শিক্ষায় শিক্ষিত। পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার অন্তর্গত তুরকখালি গ্রামের এক নমঃশূদ্র দলিত পরিবারে ১৯৫০ সালে মনোরঞ্জন ব্যাপারী জন্মগ্রহণ করেন। দেশভাগের ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহ আওনে বুদ্ধদেব, কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্যদেব প্রমুখের প্রেমবাণী স্বার্থপর রাজনৈতিক সুবিধাভোগী মানুষদের জন্য পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। সেই পরিবেশে শুধু জন্ম নিয়েছে ঘৃণা, হিংসা ও প্রতিহিংসা। যার শেষ পরিনতি হল দেশভাগ। মনোরঞ্জন ব্যাপারী বলেন—

“দাঙ্গা! দু অক্ষরের ছোট্ট এই শব্দটার মধ্যে লুকানো আছে সেই ভয়ংকর মারণ বিষ যা মানুষকে বোধবুদ্ধি বিচার বিবেচনা হীন একটা পাগলা কুকুর তুল্য জীবে পরিণত করে দেয়। যার কাছে তখন দয়ামায়া স্নেহমমতা আশা করা বৃথা।”<sup>১</sup>

মনোরঞ্জন ব্যাপারী বর্ণাশ্রমে বিভক্ত হিন্দু প্রথা অনুযায়ী সমাজের নীচের দিকে অচ্ছাৎ, অস্পৃশ্য এক চণ্ডাল জাতিতে জন্ম গ্রহণ করেছেন। প্রবল দারিদ্র্যতার কারণে তাঁর মুখে মধু পর্যন্ত পড়েনি। সেজন্যই তাঁর জীবন হয়ত মধুময় হয়ে ওঠেনি। যে ঘরে রান্না করার জন্য চাল পর্যন্ত নেই, সেখানে মধু আশা করাটা বৃথা। বিষাক্ত জীবন নিয়ে প্রতিমুহুর্তে জীবনের

পথে বাধাবিপত্তি ও লাঞ্ছনার স্বীকার হতে হয়েছে লেখককে। শাস্ত্র অনুযায়ী জন্মমাত্রই সব মানুষ শূদ্র। উপনয়নের দ্বারা সে হয়ে ওঠে দ্বিজ। এরপর কঠিন অধ্যয়ন ও সাত্ত্বিক তপস্যার মাধ্যমে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলে ব্রাহ্মণ হয়। ডাক্তারের পেটে জন্মগ্রহণ করলেই যেমন ডাক্তার হওয়া যায় না, তেমনি ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মালেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। কঠিন শ্রমের মধ্য দিয়ে তাকে অর্জন করতে হয় ব্রাহ্মণত্ব। জ্ঞান লাভ করার প্রাথমিক ধাপ যেমন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করা তেমন ব্রাহ্মণত্বে উন্নতির প্রথম ধাপ হল উপনয়ন। যা পালন করতে হয় চৌদ্দ বছর বয়স অতিক্রম করার আগে। নমস মুনির অসতর্কারি জন্য তাঁর বালক দুটির বয়স পেড়িয়ে যায়। এখন উপায় কি! এরা তো শূদ্রই থেকে যাবে। তবুও নমস মুনির পুত্র বলে কথা। সেজন্য শূদ্র হলেও এরা নমস্য। তারপর নমস মুনির বংশধরের নাম হল নমঃশূদ্র।

দেশভাগের ফলে মনোরঞ্জন ব্যাপারীর পরিবার এদেশে এসে প্রথম কয়েকদিন শিয়ালদহ স্টেশনে দিন কাটায়। তারপর সেখান থেকে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় বাঁকুড়ার শিরোমণিপুর ক্যাম্পে। এখানে আগে থেকেই কয়েক হাজার উদ্বাস্তু পরিবারকে রাখা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত বাঁকুড়া একটি ‘খরাপ্রধান উষ্ণ জেলা’। এমন এক শুষ্ক প্রখর তাপপ্রবাহময় এলাকায় সবাইকে জলকষ্টে দিন কাটাতে হয়েছিল। সরকারের পক্ষ থেকে প্রতি চৌদ্দ দিন অন্তর চাল, ডাল দেওয়া হত। একে বলা হয় ‘ডোল’। অনেকের ধারণা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাকি এসব পুরনো চাল-ডাল গুদামজাত করে রাখা হয়েছিল। সে সময় কেরোসিনের অভাবে অনেকেই রাতের রান্না দিনের বেলাতেই করে রাখত। হাজার হাজার মানুষের রান্নার ফলে গোটা এলাকা বোটকা গন্ধে ভরে যেত। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও চালের বোটকা গন্ধে বার্ড-ফ্লু ও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয়ে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারায়। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছিল ক্যাম্পের শিশুরা। কারণ সেখানে চিকিৎসার কোনো বন্দোবস্ত ছিল না। প্রায় দু’বছর দাপাদাপির পর মৃত্যুর হার কিছুটা কম হয়ে ক্যাম্পের মানুষগুলি একটু রেহাই পায়। লেখক শিরোমণিপুর ক্যাম্প আসেন সম্ভবত ১৯৫৩-৫৪ সালে। তৎকালীন পূর্ববঙ্গের নিম্নবর্ণের মানুষদের লেখাপড়া করার খুব একটা সুযোগ ছিল না। নিরক্ষরতা যে কি ভয়ঙ্কর তাঁর বাবা প্রতিমূহূর্তে টের পেয়েছে। ক্যাম্পের মধ্যেই সরকারি ব্যবস্থাপনায় একটি প্রাইমারি বিদ্যালয় চালু করা হয়েছিল। কিছুদিন চলার পর সেটিও বন্ধ হয়ে যায়। যেটুকু লেখাপড়া করার বাসনা ছিল তাও শেষ হয়ে গেল মনোরঞ্জনের। রিফিউজিরা যে চাল-ডাল পেত সরকারের পক্ষ থেকে এক সময় তাও বন্ধ হয়ে যায়। কারণ সদ্য স্বাধীন হওয়া সরকার আর দায়িত্ব নিতে চাইছে না। দেশভাগের ফলে বাঁধভাঙ্গা বন্যার জলের মতো এসব দরিদ্র অসহায় মানুষেরা বাধ্য হয়ে ভারতে আসতে শুরু করেছিল।

এসব ছিন্নমূল মানুষের দুটো ভাগ ছিল। এক ভাগ স্বচ্ছল শিক্ষিত উচ্চবর্ণের মানুষ, যাদের এক কথায় বলা হয় ভদ্রলোক। আর এক ভাগ নিঃস্ব, নিরক্ষর, নিম্নবর্ণ ও নির্ধন। এরা ভদ্রলোকদের কাছে ছোটজাত বা ছোটলোক বলে পরিগণিত হত। ভদ্রলোকেরা জাতিবিদ্বেষের জন্য সমাজের নীচের দিকের কামার, কুমোর, মুচি, পোঁদ, হাড়ি, জোলা ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মানুষদের সঙ্গে থাকতে চাননি। এসব উচ্চবর্ণের ভদ্রলোকেরা সুকৌশলে সরকার ও নেতা-মন্ত্রীদের সহযোগিতায় কলকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলগুলি জবরদখল করে দেড়শত কলোনি গড়ে তোলে। এই কলোনিতে তারা সুখে দিন কাটাতে থাকে। বাঙালির চিন্তাভাবনায় আন্দামান তখনও মানুষের বসবাসের উপযুক্ত জায়গা বলে বিবেচিত হয়নি। ওটা কঠোর শাস্তিদানের জায়গা হিসেবেই গণ্য হত সে সময়। ততদিনে অবশ্য বামপন্থীদের আন্দোলনের ফলে আন্দামানে শরণার্থীদের পাঠানো বন্ধ হয়েছে। এভাবে কয়েক বছর চলার পর সরকার ও নেতা-মন্ত্রীদের মাথায় এলো দ্বিতীয় পরিকল্পনা। যার নাম ‘দণ্ডকারণ্য পুনর্বাসন পরিকল্পনা’। এই পরিকল্পনা স্থাপিত হয় ১৯৫৮ সালের ১২ সেপ্টেম্বর মাসে। অনুন্নত দুর্গম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের ভাষা-সংস্কৃতির সঙ্গে এই মানুষগুলির কোনো যোগ নেই। সরকার সুকৌশলে এসব রিফিউজিদের দিয়ে বনাঞ্চলের সম্পদ আহরণ করা এবং মাটির নীচে মহামূল্যবান খনিজ দ্রব্য সংগ্রহের কাজে লাগাতে থাকে।

মনোরঞ্জনের পরিবার ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে ঘোলা দোলতলা ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়। সেখানে এমন এক কুঁড়েঘর যে ঘরে সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায় না। হামাগুড়ি দিয়ে ভিতরে ঢুকতে হয়। খাদ্যের সন্ধানে প্রবল সংগ্রাম, তবুও জীবন থেমে থাকে না। এ এক অনন্ত লড়াই। কাজের সন্ধানে লেখকের বাবা এদিক-ওদিক ছুটতে থাকেন। যেদিন কাজ জুটত, সেদিন বাড়িতে উনুন জ্বলত। অসুস্থ হলে সকলে জল খেয়ে অনাহারে দিন কাটত। লেখক তাঁর বাবাকে কোনোদিন পেটপুরে খেতে দেখেননি। অনাহারে বড়বোন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে প্রতিমূহূর্তে। লেখকের ভাষ্যে—

“আমার জন্মদাতা পিতা আমার চোখের সামনে পেটের ব্যথায় বিনা চিকিৎসায় তিলে তিলে মারা যাচ্ছেন। আমার গর্ভধারিণী মা এক টুকরো বস্ত্রের অভাবে গর্ভে ইদুরতুল্য জীবন যাপন করছেন। দিনের আলো তার ভাগ্যে নেই। প্রবল শীতের দিনে যে একটু রোদে এসে বসবেন তা আর পারবেন না। কেননা দিনের আলোয় ওত পেতে থাকে অসংখ্য রাক্ষুসে চোখ। যে চোখ উদ্যম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শবদেহের কৃমিকীটের মত খুবলে খেতে চায়। আমার একটা বোন না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরে গেছে। তিনটে ভাইবোন শুকোচ্ছে। কদিন পরে মরবে। আমার বুড়ি দিদিমা থলি নিয়ে বাজারে পঁচা আলু পোঁকা বেগুন শুকনো শিম যা চাষিরা ফেলে দিয়ে গেছে তা কুড়িয়ে বেড়ায়। যদি ওই পরিত্যক্ত বস্তুর মধ্যে একটু বেঁচে থাকার উপাদান মিলে যায়।”<sup>২</sup>

পরিবারের এই করুণ পরিণতি দেখে মনোরঞ্জন ব্যাপারী কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। দুর্ভিক্ষের এই অন্ধকার থেকে একমুঠো ভাতের আশায় জীবন তাঁর ছুটে চলছে। মানুষ কি খায় আর কি খায় না এই প্রশ্নের উত্তর মনোরঞ্জনের জানা নেই। ক্ষুধা যন্ত্রণায় এই পৃথিবীতে মানুষকে কতকিছু খেতে দেখেছেন মনোরঞ্জন ব্যাপারী, তা বলে শেষ করা যাবে না। ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ জংলা কচু, কচি খেজুরের আঠা, বুনো ডুমুর, খারকোল, বুনো কুল, খেজুর গাছের মাথি, মছয়া ফল, শাপলা গাছের গোড়ায় জন্মানো ড্যাপের খই, চরোটা গাছের পাতার সেক্সসহ আরো অনেক কিছুকেই খাদ্য সামগ্রী হিসেবে বেছে নিয়েছিল। একসময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে উপায় না পেয়ে স্টেশনে গিয়ে আশ্রয় নেন। স্টেশনে মানুষের আওয়াজ, রেলের শব্দ, শেয়ালের ডাকের মাঝে অভুক্ত অবস্থায় তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। স্টেশনের এক ব্যক্তি জানতে চান— ‘কোথায় যাবি?’ লেখক তার কথার কোনো উত্তর দেন না। উত্তর থাকবেই বা কি করে। ভাতের সন্ধানে সে তো বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। লোকটি আবার বলতে থাকে—

‘আমার বাড়ি যাবি? থাকবি আমার বাড়ি? ভাত খেতে দেব’। এ কথাগুলির মধ্যে আদর ছিল। যে আদরের মধ্যে লুকিয়ে আছে ভয়ঙ্কর এক শোষণ, জাতপাত-ধর্মের গ্লানির বীভৎস রূপ। ছোট্ট মনোরঞ্জনের তখনও সে জ্ঞান হয়নি। ক্ষুধার জন্য প্রতিমুহূর্তে শুধু ভাত খোঁজে। একমুঠো ভাতের জন্য রূপ রস ও গন্ধ সব ভুলে গেছে। মনোরঞ্জন ব্যাপারী জানান—

“ভাত! আহা রে! সেই কবে কতকাল আগে যেন ভাত খেয়েছিলাম। কী তার রঙ রূপ ঘ্রাণ আর স্বাদ। সে স্বাদ গন্ধে যেন প্রাণ জুড়িয়ে যায়। ভাতের নামে কাত হয়ে যায় এক যুগান্তর অনাহারি বালক। সে লোকটার পিছন পিছন হেঁটে গিয়ে পৌঁছায় তার বাড়ি। কেন আমাকে ভাত দেওয়া হবে পথে আসতে আসতে তা বুঝিয়ে বলে দেন তিনি - কটা গরু আছে, তাদের একটু খড় বিচালি ঘাস জল দেওয়া, গোয়ালটা একটু সাফ সাফাই করা, এই সব আর কী।”<sup>৩</sup>

ডাক্তারের বাড়িতে নমঃশূদ্র চণ্ডাল জাত জেনে যাওয়ায় সে কাজও বেশিদিন টিকলো না। অবজ্ঞা, অপমান নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে আসেন মনোরঞ্জন। কিশোর বয়সেই জাত-পাতের এক প্রত্যক্ষ কুৎসিত রূপ অনুভব করেন। এরপর যাদবপুরে জাত পরিচয় গোপন রেখে জীবন নাম নিয়ে তিনি এক চায়ের দোকানে দশ টাকা বেতনের কাজে নিযুক্ত হন। কিন্তু সে কাজও বেশিদিন রইল না। ঘুরে ফিরে তাঁকে যাদবপুরে ফিরে আসতে হয়।

বাবাকে বিনা অপরাধে পুলিশের কাছে মার খেতে দেখেছেন মনোরঞ্জন। সেজন্য পুলিশের প্রতি ছোট থেকেই তাঁর ঘৃণা জন্মেছিল। এর পরে তিনি এক মেসে রান্না করার সহযোগিতার কাজ পান। কিন্তু সেখানেও ঘটে বিপত্তি। পায়ু মৈথুনে রাজি না হওয়ায় মেসের ঠাকুর প্রতিটি কাজে তাঁর ভুল ধরতে থাকে। বাধ্য হয়ে আবার তিনি স্টেশনে থাকতে শুরু করেন। স্টেশনে এক ভবঘুরে বাউণ্ডলে ছেলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সে আসাম যাওয়ার কথা বলে। আসামে নাকি কাজের কোনো অভাব নেই উপরন্তু তিন-চার গুন বেশি মজুরী পাওয়া যায়। জীবনে বেঁচে থাকতে হলে টাকা চাই। মার কাপড় কিনে দিনের আলোতে বাইরে নিয়ে আসার স্বপ্ন। বাবার চিকিৎসার বন্দোবস্ত ও ভাইবোনকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর কথা ভাবেন। তৃষ্ণার্ত মানুষ যেমন জল মনে করে মরীচিকার দিকে পাগলের মত ছুটে চলে তেমনি তিনিও ছুটে চললেন সদ্য চেনা ছেলোটর পিছনে। মনোরঞ্জনের ভাষে -

“সেই বিচিত্র বিচ্ছিন্ন ভ্রমণ কাহিনী লিখেছিলাম আমার ‘চণ্ডাল জীবন’ উপন্যাসে। যা লিখেছিলাম, যেমন লিখেছিলাম সেটাই তুলে দিলাম এই আত্মজীবনীর মধ্যে।”<sup>৪</sup>

শেষপর্যন্ত আসামে কাজের খোঁজে গিয়েও খুব একটা লাভ হয় না। মাসের পর মাস কাজ করেও প্রাপ্য মজুরিটুকু পাননি মালিকের কাছ থেকে। তার বদলে জুটেছে মার, অপমান। একদিকে ক্ষুধার ভয়ঙ্কর জ্বালা অন্যদিকে পরিবারের জন্য দুশ্চিন্তা। জীবিকার খোঁজে শিলিগুড়ি, লক্ষ্মী, কানপুর, দিল্লি, ছত্তিসগড়সহ একাধিক জায়গায় ঘুরেছেন মনোরঞ্জন ব্যাপারী। তিনি সবটাই করেছেন ক্ষুধা যন্ত্রণার জন্য। এই বিচিত্র পৃথিবীতে তিনি কত বিচিত্র মানুষের কাজ করেছেন নির্যাতিত হওয়ার পরেও। এ সবকিছু সহ্য করেও তিনি তাঁর কাজের প্রাপ্য বেতনটুকু পর্যন্ত পাননি। হয়তো কমবয়সি বলে সবাই ঠকিয়েছে। মানুষের প্রতারণা, বেইমানি, ছোটজাত বলে গালি দেওয়া ইত্যাদিকে মুখ বুঝে সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। জীবনের অজস্র অভিজ্ঞতা অল্পসময়েই সঞ্চিত হয়েছে তাঁর মনে। কখনো কখনো ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে কুকুরের মুখ থেকে অবশিষ্ট খাবার পর্যন্ত ছিনিয়ে খেতে দ্বিধা বোধ করেননি। নিজেকে ‘জীবন’ নামে পরিচয় দেন সকলের কাছে। শেষে তাঁর এতটা অধঃপতন যে কুকুরের মুখের খাবার পর্যন্ত ছিনিয়ে খেতে হচ্ছে। দারিদ্র্যের যে আরো কত ধরনের রূপ আছে মনোরঞ্জনের তা জানা নেই। খাদ্যের সন্ধানে প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হচ্ছে, তারপরেও বাঁচার অদম্য ইচ্ছাশক্তি তাঁর। কয়েক বছর এভাবেই কেটে যায়। বাধ্য হয়ে আবার যাদবপুরে ফিরে আসেন তিনি। মা-বাবা, ভাই-বোনের চোখে-মুখে ও পেটে এক অনন্ত ক্ষুধার ছাপ লক্ষ্য করেন তিনি। মনোরঞ্জন ব্যাপারী জানিয়েছেন—

“কি করতে আইলি! আমরা মরছি কীনা দ্যাখতে আইলি বুঝি? মরি নাই আমরা। মরলে তহন আইস্যা পোড়াইয়া যাইস’ আমার মৌনতায় তিনি আরও ত্রুঙ্ক হয়ে ওঠেন - ‘পোলা জন্মাইলে বাপের বুকে হাতির বল হয়। ভাবে, পোলায় বড় হইলে আর আমার কষ্ট দুঃখ এত থাকবো না। পোলায় সে বোঝা কিছু হালকা করবো। কিন্তু পোড়া কপাল আমাগো। পোলায় যেই বড়ো হইছে, পাখনা গজাইয়া গেল তার। যেদিক মৌন লয়, ওড়তে আছে। আমরা আছি না গেছি হেতে তার কিছু যায় আসে না।”<sup>৫</sup>

বাবার কথার মধ্য দিয়ে জীবন যন্ত্রণার এক ভয়ঙ্কর ক্ষুধার ছাপ দেখতে পান মনোরঞ্জন ব্যাপারী। যা বাবা সারাটা জীবন ভোগ করে এসেছে। সমাজ থেকে বাবা যা পেয়েছে ছেলেও তাই পাচ্ছে। এই দেশ ও সমাজের কাছে কিশোর মনোরঞ্জন কতখানি অসহায় ও অক্ষম সে কথা সহজ সরল বাবার জানা ছিল না। দুর্বল বাহুতে নিজের প্রাপ্যটুকু আদায় করার শক্তি এখনো হয়নি তাঁর। এরপর একরাশ হতাশা নিয়ে মনোরঞ্জন বাড়ি ত্যাগ করে কাজের সন্ধানে আবার বেরিয়ে পড়েন। জাতি পরিচয় গোপন রেখে এক মেসে রান্না করার কাজ পান। কিন্তু নমঃশূদ্র নিম্নবর্ণের মানুষ পরিচয় জেনে যাওয়ায় সে কাজও আর বেশিদিন থাকলো না। বাবা সৎ হওয়ার জন্য বারবার অপমানিত হতে দেখেছেন। ছোটজাত বলে পাড়ার মাঠে ভাই-বোনদের খেলতে দেওয়া হত না। হাঁস চুরির মিথ্যা অপবাদে তাঁর ভাইকে বিনা অপরাধে মারধর করে বাসকের পরিবার। পাল্টা মারে মনোরঞ্জনও প্রতিবাদ করে। মার খেতে খেতে তিনিও এখন পাল্টা মার দিতে শিখে গেছেন। এরপর উঠতি মস্তানদের কাছ থেকে অস্ত্র চালানো, বোমা বাঁধা শিখে নানান অসামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়েন তিনি। নকশাল আন্দোলন এই সময়ে গোটা বাংলা তথা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। শোষণমুক্ত এক সমাজ বিপ্লব গড়ার স্বপ্নে উৎসাহিত হয়ে নকশাল আন্দোলনে যোগ দেন তিনি। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে নকশাল আন্দোলনে জড়িত থাকার জন্য তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু প্রমাণ না থাকার জন্য খুব জোর বেঁচে যান মনোরঞ্জন ব্যাপারী। ঘটনাক্রমে একদিন পুলিশ কুঁড়েঘরে হানা দিয়ে নকশাল নেতা সন্দেহে গ্রেফতার করে। কোনো তথ্য না পেয়ে একটি মিথ্যা কেসে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেয়। জেলে দশ বছরের সাজা হওয়ার জন্য কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন তিনি। এই করুণ অবস্থা দেখে সাব্বনা দিতে জেলের এক কয়েদি এগিয়ে আসে। কি কেস, কত নং ধারা এসব নানান প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে থাকে জেলের ওই কয়েদি ব্যক্তিটি। উত্তরে মনোরঞ্জন জানান আমি এসবের কিছুই জানি না। আমার কোন অক্ষর জ্ঞান নেই। কয়েদি ব্যক্তিটি তাঁকে জেলের মধ্যে এই সময়কে কাজে লাগাতে বলেন। বিভিন্নভাবে তাঁকে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেন। কাছে ডেকে এনে জেলের জানলা থেকে দেখান। তিনি বলেন —



“কিছু দেখতে পাচ্ছি! ভালো করে ন্যাশনাল লাইব্রেরির কার্নিশটা দ্যাখ। দেখতে পাচ্ছি একটা ছোট বটের চারা। এবার বল দেখি, ওখানে এই বটের চারাটা বেঁচে আছে কি করে? সিমেন্টের নিরেট কার্নিশ, ওখানে রস কোথায়? রসদ কোথায়? আমি কোন জবাব দিতে পারছি না দেখে জবাব উনিই দেন - ওখানে রস-রসদ আছে, চারাটার বেঁচে থাকাটাই এ কথার বড় প্রমাণ। তা না হলেও তো মরে যেত। আপাতদৃষ্টিতে যা নীরস কঠিন কঠোর ও সেখানে রস পেল কর করে? পেয়েছে, কারণ, সে খুঁজেছে। খুঁজেছে, কারণ সে বেঁচে থাকতে চায়। তাহলে এটা এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য - যে খোঁজে সে পায়, যে খোঁজে না সে পায় না।”<sup>৬</sup>

জেলখানার সেই কয়েদির কাছে ২৬ বছর বয়সে প্রথম অক্ষর জ্ঞান হয় মনোরঞ্জন ব্যাপারীর। জেলের ধুলোমাখা উঠানে বাঁশের কণ্ঠ দিয়ে প্রথম বর্ণপরিচয়ের হাতেখড়ি হয় তাঁর। এরপর রাত জেগে চলতে থাকে পড়াশুনা। হাতের কাছে যে বই পায়, সে বই পড়ে শেষ করে। একটা সময় ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাজের খোঁজে নানান প্রান্তে তাঁকে ছুটতে হয়েছে। আর এখন তাঁকে এক ভয়ঙ্কর খিদে আচ্ছন্ন করে ফেলে তা হল পড়াশুনা। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তিনি এক সুগু বাসনা নিয়ে বেড়িয়ে আসেন। একদিকে ক্ষুধা ও অন্যদিকে ঠাই পেল বই। রিকশার নীচে এখন আর চাকু থাকে না, থাকে অনেক বই। সওয়ারি না থাকলে অবসর সময়ে বইয়ের পাতায় ডুবে থাকতেন। এদিকে চরম দারিদ্র্যতা আগামীকাল কি খাবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। বইপড়া দেখে অনেকে ব্যঙ্গ-বিদ্রোপের স্বরে ‘বিদ্যাসাগরের বাচ্চা’ বলেও কটাক্ষ করেছে। ভদ্রলোকদের অপমান, গ্লানি তাঁকে আর স্পর্শ করতে পারেনা। সমস্ত কষ্টকে উপেক্ষা করে বই তাঁর জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়ে ওঠে। ছোটবেলার চণ্ডাল জীবনের যে যন্ত্রণা তা তিনি শৈশবেই সচক্ষে দেখেছেন। একদিন যাদবপুরে এক ভদ্রমহিলা তাঁর রিকশায় ওঠেন। কৌতূহল বসত ‘জিজীবিষা’ শব্দের অর্থ কোনোমতেই খুঁজে পাচ্ছেন না লেখক মনোরঞ্জন ব্যাপারী। তাই তিনি এই শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করেন। এরকম একটা কঠিন সংস্কৃত শব্দের মানে জানতে চাইছে দেখে চমকে ওঠেন ওই ভদ্রমহিলা। তিনি বলেন ‘জিজীবিষা’ শব্দের মানে হল ‘বেঁচে থাকার ইচ্ছা বা বাঁচবার ইচ্ছা’। পরে জানতে পারেন ওই ভদ্রমহিলা মহাশ্বেতা দেবী। তাঁরই অনুপ্রেরণায় ১৯৮১ সালে ‘মদন দত্ত’ ছদ্মনামে ‘রিকশা চালাই’ ‘বর্তিকা’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মনীশ ঘটক এবং পরবর্তীতে মহাশ্বেতা দেবী। মনোরঞ্জন ব্যাপারী জানিয়েছেন—

“মহাশ্বেতা দেবীর সম্পাদনায় প্রকাশিত পত্রিকা বর্তিকায় আমার লেখাটি স্থান পেয়ে যাওয়ায় - মানুষের দৃষ্টিপথে এসে গেলাম আমি। যাতে আরো একটি বিশেষ মাত্রা যোগ হল যখন যুগান্তর পত্রিকার পাতায় এক পুস্তক সমালোচক আমার লেখাটির প্রশংসা করে দুলাইন লিখে দিলেন। যা আমার উৎসাহকে দশগুণ বাড়িয়ে দিল - আমি পারি। আমি পেরেছি।”<sup>৭</sup>

মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ তাঁর জীবনে এক আমূল পরিবর্তন এনে দেয়। লেখকের এ এক নতুন উপলব্ধি।

তিনিও পারেন নিজের অনুভূতি যন্ত্রণাকে কাজে লাগিয়ে দলিত, শ্রমজীবী মানুষদের কথা বিশ্বদরবারে পৌঁছে দিতে। অভিশৃঙ্খলিত অবস্থা থেকে তুলে এনে এক নতুন জীবনের সন্ধান দিয়েছেন মহাশ্বেতা দেবী। লেখক গভীরভাবে ভাবতে শিখেছেন ‘জিজীবিষা’ শব্দের প্রকৃত অর্থ। মানুষ তো অনেক রকমভাবেই বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু সে বাঁচা কি আর প্রকৃত বাঁচা। মরার পরে যা সব ফুরিয়ে যায়, সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায়। তিনি অনুভব করেন বটবৃক্ষের সর্বক্ষণ তাঁকে ছায়া দান করেছেন মহাশ্বেতা দেবী। বেঁচে থাকার এক নতুন সংকল্প খুঁজে পান লেখক মনোরঞ্জন ব্যাপারী।

‘ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন’-এ বৃহৎ পরিসরে মনোরঞ্জন ব্যাপারী তাঁর ব্যক্তিজীবনের বড় হয়ে ওঠা ও বেঁচে থাকার নানান সংগ্রামের কথা অনায়াসে বলে গেছেন। বিশ্বসভ্যতার নামে বিশ্ববর্বরতারই চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাঁর জীবনে। তবে সব কথা কি তিনি বলতে পেরেছেন? হয়তো সম্ভব নয়। অনেক সময়ে উপযুক্ত ভাষা তিনি পাননি। যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কেননা দলিতের ভাষা হচ্ছে উৎপাদন নির্ভর সংযোগমূলক ভাষা। প্রচলিত ভাষা থেকে দলিতের ভাষা সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁর চোখের সামনে যা ঘটে গেছে তাই তিনি লিখেছেন। কিশোর বয়সে বর্ণহিন্দুদের নির্যাতন, দেশভাগ, দাঙ্গা, রিফিউজি, মরিচবাঁপি, দণ্ডকারণ্য, শরণার্থী ক্যাম্পসহ নানান জায়গায় তাঁকে জীবনের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। ‘হৃদয়

খুঁড়ে বেদনা জাগাতে' তিনি একদমই ভয় পাননি। নিজের চোখের সামনে দিয়ে ঘটে যাওয়া নানান ঘটনাবলী এবং জীবনকে বিধ্বস্ত ও অস্থির করে দেওয়ার কথাকে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর সাহিত্যে। জাতপাত, শাসন-শোষণ কীভাবে একটি শ্রেণীর মানুষকে পুড়িয়েছে তা তিনি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। 'ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন' কেবল আত্মজীবনী নয়, সে আত্মজীবনী হচ্ছে গোষ্ঠীর আত্মজীবনী। লক্ষ লক্ষ মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা, শাসন-শোষণের কথাকে তিনি তাঁর এই আত্মজীবনের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। গোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠীর সংহতিবোধের কথা এবং গোষ্ঠীর কল্যাণের কথা বলা হয়েছে। সেজন্য দলিতের ক্ষেত্রে দলিত আত্মজীবনী খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লেখক এত অবহেলা ও লাঞ্ছনা হওয়ার পরেও কোথাও যেন জীবনের প্রতি মায়া ও বিশ্বাস তৈরি হয়ে যায়। তিনি বলেন— 'জীবন এক যাত্রা, জীবন এক যুদ্ধ, জীবন এক অভিজ্ঞতার নাম'। মনোরঞ্জন ব্যাপারীর লেখায় উঠে আসে সমাজের দরিদ্র, অস্পৃশ্য, ব্রাত্য, আদিবাসী ও শ্রমজীবী মানুষদের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের কথা। এই শ্রেণিবিভক্ত সমাজ গরীব এবং বড়লোকের হয় না। বর্ণ ভাগ করে ধর্ম ভাগ করে রাজনীতি ভাগ করে আর এই ভাগভাগির জগতে দলিত, দরিদ্র অসহায় সং মানুষেরা কোথায় দাঁড়ায় সমাজে তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন লেখক। ইতিহাসকে আধার হিসাবে 'ইতিবৃত্ত' শব্দটিকে তিনি ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ নতুন কিছু নয়, সমাজের চারপাশটা শুধু বদলে যাচ্ছে, চাঁড়াল চাঁড়ালই থেকে যাচ্ছে। 'ইতিবৃত্ত চণ্ডাল জীবন' ইংরেজি অনুবাদ Interrogating my Chandal Life জন্য ২০১৮ সালে হিন্দু পুরস্কার পান। এছাড়াও বাংলা অকাদেমি পুরস্কার, ডিসসি প্রাইজসহ একাধিক পুরস্কার ও সম্মাননা তাঁকে দেওয়া হয়।

পরিশেষে বলতে হয় মনোরঞ্জন ব্যাপারীর 'ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন' বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য সৃষ্টি। সম্ভবত বাঙালি দলিত সাহিত্যে কোনো দলিত লেখকের প্রথম আত্মজৈবনিক উপন্যাস নির্দিধায় বলা যায়। মনোরঞ্জন ব্যাপারী স্ব-শিক্ষায় শিক্ষিত একজন মানুষ। তিনি বলেন - 'মানুষ যেমন খেলতে খেলতে খেলোয়াড় হয়, আমি লিখতে লিখতে লেখোয়াড় হয়েছি'। যা বাংলা সাহিত্যে তথা বিশ্বদরবারে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

## Reference:

১. ব্যাপারী, মনোরঞ্জন, 'ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন', দে পাবলিকেশন, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈশাখ ১৪২৬, কলকাতা, পৃ. ২৫
২. তদেব, পৃ. ৪৪
৩. তদেব, পৃ. ৪৮
৪. তদেব, পৃ. ৬০
৫. তদেব, পৃ. ১১৪
৬. তদেব, পৃ. ১৮৫
৭. তদেব, পৃ. ২১৫

## Bibliography:

### সহায়ক গ্রন্থ :

পাল বাবুল কুমার, 'বরিশাল থেকে দণ্ডকারণ্য', গ্রন্থমিত্র প্রকাশক, প্রথম প্রকাশ ২০১০, কলকাতা।  
 বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, দাশগুপ্ত, অভিজিৎ, 'জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ', আই সি বি এস প্রকাশনী, পুনর্মুদ্রণ ২০২২, দিল্লি।  
 বালা, যতীন, 'দলিত রচনা দলিত লেখক', ১ম খন্ড, গাঙচিল প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা ২০২০, কলকাতা।  
 ভদ্র, গৌতম, চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, 'নিম্নবর্ণের ইতিহাস', আনন্দ পাবলিশার্স, নবম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৮, কলকাতা।  
 লিখালে, শরণকুমার, 'দলিত নন্দনতত্ত্ব', (অনুবাদ) মৃন্ময় প্রামাণিক, তৃতীয় পরিসর, দ্বিতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ২০২১, কলকাতা।

### ইংরেজি গ্রন্থ :

Mukherjee, Sipra, translator. *Interrogating my Chandal Life. An Autobiography of a Dalit.* By Manoranjan Byapari, Sage Publications India Pvt Ltd, 2018.